ইউনিট-২ বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি

History, Society and Culture of Bangladesh

ভূমিকা

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে, ১৯৭১সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করে। এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি হয়। এছাড়াও অপরিমেয় সম্পদহানি ঘটে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ, দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অঞ্চলের জনগণ আশা করেছিল যে, ব্রিটিশ শাসন অবসান এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হবার ফলে তাদের ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্যের অবসান হবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালিদের আশাভঙ্গ হয়। অত:পর ১৯৭১'র যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। ইতিহাস প্রমাণ করে, নিজেদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালি কখনো পরদেশে আগ্রাসন চালায়নি বরং বারবার বিদেশী শক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন শাসক শ্রেণীর আগমনের প্রভাব পড়েছে বাঙ্গালির সমাজ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে। নিজস্ব সমাজ -সংস্কৃতির সাথে ভিনদেশী সমাজ-সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালির ইতিহাস। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ইউনিটে পাঁচটি পাঠ রয়েছে। যথা-

- *পাঠ - ১ বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস।*
- *পাঠ - ২ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো।*
- *পাঠ - ৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।*
- *পাঠ - ৪ বাংলাদেশের উপজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি।*
- *পাঠ - ৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন ।*

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস

পাঠ-১

Social History of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ সামাজিক ইতিহাস বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

সামাজিক ইতিহাস

এমন এক সময় ছিল, যখন ইতিহাসকে খুব সংকীর্ণ অর্থে বোঝার চেষ্টা করা হোত, সে 'ইতিহাসে' দেশ বা সমাজের সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবন যাপন, সুখ-দু:খ, আন্দোলন সংগ্রামের বর্ণনা ঠাঁই পায়নি। বরং সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, রাজা বা সম্রাটের দেশ জয়, সিংহাসন আরোহন, সুখ-দু:খ, কীর্তি-কাহিনী ইত্যাদিই ছিল মূল উপজীব্য বিষয়। সেখানে সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের ইতিহাস আলাদা ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আধুনিক সময়ে ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখনকার ইতিহাসবিদ মনে করেন, ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনার বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশে- ষণ ও বর্ণনা। যেহেতু 'মানুষ' ইতিহাসের মূল উপাদান সেহেতু সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিফলন ইতিহাসে থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। সংকীর্ণ ইতিহাস চর্চার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব। সামাজিক ইতিহাসে সামাজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ পরিবর্তন, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ধারা ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর রাজনীতি অথবা ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক ইতিহাসের বিষয় নয়। সামাজিক ইতিহাসে স্থান পায় জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা -পদ্ধতি, আইন, নিয়ম-কানুন, উৎসব-প্রতিষ্ঠান, ভাষা, ধর্ম, শিল্পকলা, আর্থ-সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ভিকো'র মতে, 'Man makes his own history'. পরবর্তীতে মার্কস ও এঙ্গেলস একই মত ব্যক্ত করেন। বস্তুতঃ সামাজিক ইতিহাস বলতে বোঝায় সামগ্রিক ইতিহাস, যেখানে সকল ইতিহাসই একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামোয় স্থান পায়। সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর হাবিবুর রহমান সামাজিক ইতিহাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন-

আধুনিক ইতিহাসে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিফলন ঘটে।

- ঐতিহাসিক সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান।
- সমাজ পরিবর্তন।
- সামাজিক পদ ও প্রত্যয় এর বিকাশ।
- সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন।

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা:

ক) প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল

খ) ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল

প্রাচীন বাংলায় জনবসতি কবে থেকে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও গবেষকগণ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমান করেন, কমপক্ষে দশহাজার বছর পূর্বে থেকে এই বাংলা অঞ্চলে মানুষ বসবাস শুরু করে। মানুষদের বেশির ভাগই কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি জাতিভুক্ত ছিল। মনে করা হয়, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অনার্য মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী যারা তিব্বত থেকে এ

অঞ্চলে এসেছিল বলে মনে করা হয়, তারা পশু 'শিকার' ভিত্তিক জীবন যাপন করতো এবং তারপরে আগত দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী যারা চীনা তুর্কিস্তান থেকে এ অঞ্চলে এসে থাকতে পারে, তারা খাদ্যশস্য চাষ এবং পশুপালন প্রণালী জানতো। এই অনার্য জনগোষ্ঠী হিংস্র জীবজন্তু, নিবিড় অরণ্য, উঁচু পর্বত, প্রাকৃতিক বিপদের আশংকা থেকে পরস্পর কাছাকাছি বাস করতো, এভাবেই প্রাচীন ভারত তথা বাংলা অঞ্চলে উপজাতীয় সমাজগুলো তৈরি হয়। এ সমাজে চাষের জন্য যে কেউ যে কোন জমি চাষ করতে পারতো, জমির কোন মালিকানা ছিল না। সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবেই তৈরি হয় গ্রাম এবং এ গ্রামগুলোতে এক ধরনের সরকার ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্যদের আগমন

দশহাজার বছর পূর্বে থেকে এই বাংলা অঞ্চলে মানুষ বসবাস শুর"র করে।

মনে করা হয় খ্রিষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে আর্যরা ইরান অথবা মধ্য এশিয়া থেকে ভারত বর্ষে আসতে শুরু করে।পরবর্তীতে নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধির জোরে আর্যরা ভারতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে পদানত করে। কিন্তু বিভিন্ন প্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই একটি অতি প্রাচীন বাঙ্গালি নগর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বাংলার মানুষ তামা, লোহা সহ বিভিন্ন ধাতু ব্যবহার করত। এই নগর সভ্যতা ছিল সুপরিকল্পিত এবং প্রকৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত। এছাড়াও পশ্চিম বাংলায় দশহাজার বছর আগেকার প্রাপ্ত যুদ্ধাস্ত্রসমূহ প্রমাণ করে যে প্রাচীন বাঙ্গালিরা একটি বীর জাতি ছিল। যদিও তারা কখনো ভিনদেশে আগ্রাসন চালায় নি। এয়োদশ শতকের প্রথম থেকে বাংলা অঞ্চলে তুর্ক-আফগানদের বিজয় সূচিত হয়। এর পূর্বে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ড় পাল বংশ বাংলা শাসন করে। পূর্ববর্তী এই শাসন ব্যবস্থাসহ মুঘল শাসনও বাঙলার সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে।

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা লাভ করে। দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছরের উপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে বাঙ্গালি সমাজ জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রিটিশরা শাসন এবং লুণ্ঠনের সুবিধার জন্য নতুন ধরনের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়। এসবের ফলশ্রুতিতে, ইংরেজী শিক্ষিত একটি শ্রেণী বাংলাদেশে তৈরি হয়। যারা শুর"তে ব্রিটিশদের অনুগ্রহভাজন থাকলেও পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক লুণ্ঠনের ফলে বাংলার এককালীন স্বনির্ভর ধাঁচের অর্থনীতি ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়।

ধর্ম নির্ভর জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা ভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্ড়নী শাসন

১৯৪৭ সালে 'দ্বি জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। পূর্ব বাংলা, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্ড়নী শাসক চক্রও ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ চালাতে থাকে। এর বিরুদ্ধে বাঙ্গালিরা তাদের বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। এ সময়ে ধর্ম নির্ভর জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষা ভিত্তিক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারকথা: *ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনার বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনা। নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিফলন থাকবে ইতিহাসে। সামাজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ পরিবর্তন, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ধারা এগুলোই সবই সামাজিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল এবং ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ। কমপক্ষে দশহাজার বছর আগে এই বাংলা অঞ্চরে মানুষের বসবাস শুরু বলে অনুমান করা হয়। মানুষের বেশিরভাগেই কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চরুাল প্রভৃতি জাতিভুক্ত ছিল।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ইতিহাসের মূল উপাদান

ক. রাজা-রাণী;

খ. প্রাচীন দালান-কোঠা;

গ. মানুষ;

ঘ. সামন্ড়প্রভূ।

২. বাঙলা অঞ্চলে মানুষের বাস শুরু

ক) ২০,০০০ বছর পূর্বে;

খ) ১০,০০০ বছর পূর্ব;

গ) ১৫,০০০বছর পূর্বে;

ঘ) ৩০,০০০ বছর পূর্বে।

৩. পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয়

ক) ১৬৫৭ সাল;

খ) ১৭৫৭ সাল;

গ) ১৮৫৭ সাল;

ঘ) ১৯৫৭ সাল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারতে আর্য জনগোষ্ঠীর আগমন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ব্রিটিশ শাসনে বাঙলার সমাজ জীবনে কি পরিবর্তন হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : ১.গ, ২.খ, ৩.খ

সহায়ক গ্রন্থ

১. *ড: মোহাম্মদ হাননান ' কারা বাঙালি কেন বাঙালি'(১৯৯৮); ঢাকা*

2. *Kamruddin Ahmad, 'A Socio Political History of Bengal' (4th ed. 1975) ; (Dhaka)*

পাঠ-২

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো
Social Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- সমাজ এর সংজ্ঞা আলোচনা করতে পারবেন।
- সমাজ কাঠামো বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজ

'সমাজ' প্রত্যয়টিকে কোন একটি মাত্র সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এর কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে বিভিন্ন অর্থে বুঝাতে চেয়েছেন। নিম্নে কয়েক জন সমাজবিজ্ঞানীর 'সমাজ' সম্পর্কিত ধারণা উল্লেখ করা হলো।

ম্যাকাইভার

ম্যাকাইভার (Maciver)'র মতে সমাজ অর্থ সহযোগিতা, এটা এক ধরণের জটিল সামাজিক সম্পর্ক যা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে।

গিডিংস

গিডিংস (Giddings)'র মতে, সমাজ বলতে বোঝায় এমন একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতায় রত।

ওয়েস্টারমার্ক

ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) মনে করেন, সমাজ হচ্ছে এমন একদল ব্যক্তির সমষ্টি যারা পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা জীবন যাপন করে। মোট কথা, সমাজ মূলত: একটি বিশেষ সংগঠন, যা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সমাজে বসবাস করে সেহেতু সমাজ নামক সংগঠনের বিধিবিধান সবাইকে মেনে চলতে হয়। সমাজ অর্থ সহযোগিতা এ জন্য যে সমাজ হলো পারস্পরিক ধ্বংস সাধনের মানসিকতার পরিবর্তে পারস্পরিক সৃজনশীলতা, সৌহার্দ ও সহযোগিতা। এমন এক জনগোষ্ঠী দ্বারা 'সমাজ' গঠিত হয়, যারা একটি সাধারণ সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় একই প্রথা, জীবন প্রণালী দ্বারা একই সাথে বসবাস করে।

সমাজ হলো পারস্পরিক ধ্বংস সাধনের মানসিকতার পরিবর্তে পারস্পরিক সৃজনশীলতা।

জিসবার্ট

জিসবার্ট (Gisbert)'র মতে মানুষের সাথে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলা যায়। একে অপরের সাথে ভাবের আদান প্রদান থেকেই সম্পর্ক সামাজিক হয়। এ জন্যে সমাজ হচ্ছে প্রধানত: একটি মানসিক প্রপঞ্চ।

মার্কসবাদী ধারণা

মার্কসবাদী ধারণায়, সমাজকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতামূলক মনে করা হয় না। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সহযোগিতাময় অবস্থার পরিবর্তে শ্রেণী সংঘাত বিদ্যমান। এজন্য মার্কসবাদী চিন্তা বিদরা মনে করেন, সমাজের মধ্যে সহযোগিতা এবং সংঘাত উভয়ই থাকতে পারে।

সুতরাং সমাজ হচ্ছে এমন একদল ব্যক্তির সমষ্টি যারা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বসবাস করে, এ সম্পর্ক হল মূলতঃ সৌহার্দ ও সহযোগিতার। তবে এখানে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতও আছে। সমাজের বিধিবিধান সবাইকে মেনে চলতে হয়।

সমাজ কাঠামো

সমাজ পরিবর্তনশীল। এখানে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। চিরস্থায়ী নয়। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস সমাজকে তুলনা করেছিলেন প্রবাহমান নদীর সাথে। সমাজের পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত: সমাজ পরিবর্তন হতে পারে সংস্কারমূলক অর্থাৎ পুরোনো সমাজ কাঠামোর ভিতরেই পরিবর্তন সাধন। দ্বিতীয়ত: বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী বলেই সমাজ কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আবশ্যক।

সমাজ প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় মূর্ত নয়। সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। তাই প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের কাঠামো সম্পর্কে যে ভাবে ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ একটি বস্তু কি উপাদান দ্বারা তৈরি, উপাদানগুলো কী ভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত বা সম্পর্কিত সমাজ কাঠামো সম্পর্কে সেরকম দৃশ্যমান ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই মানব সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে, সেহেতু সমাজ কাঠামো বলতে আমরা বুঝি, আন্ত:ব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলো আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সমাজ কাঠামোর বিশেষ কোন আকার বা অবয়ব নেই। আবার সমাজ কাঠামো কোন অলীক কল্পনা নয়। তাই সমাজ কাঠামোর বাস্ড়ব রূপ অংকন করা দূরূহ। এজন্যই সমাজ কাঠামো সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করতে হলে সমাজে বিরাজিত কতগুলো সত্তা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন- জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র, পরিবার, শ্রেণী, সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক, প্রচলিত বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি।

সমাজ কাঠামো বলতে আমরা বুঝি আন্ত:ব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক।

সমাজের মূল কাঠামো কি পরিবর্তনশীল?

সমাজের মূল কাঠামো পরিবর্তনশীল কী না এ প্রশ্নের উত্তরে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন, সমাজের সত্যিকার মূল কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। তাঁরা মনে করেন ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং আদর্শগত অবস্থানের কারণে সমাজে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে, মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, শ্রেণী স্বার্থের ফলে রাজনৈতিক ধারা এবং সমাজ পরিবর্তিত হয়। সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটলে সাম্যবাদী সমাজ কাঠামো গড়ে উঠবে। সে সাথে সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো আলোচনায় বাংলাদেশকে গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজ কাঠামো

বাঙালি জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস তৈরি করতে হলে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে এবং কৃষিনির্ভর জীবন যাপন করে। গ্রামীণ বাংলাদেশে 'ভূমি' প্রধান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতেই সাধারণত: গ্রামীণ জনগণের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতেই গ্রামের উৎপাদন সম্পর্ক এবং আর্থিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বর্তমানে গ্রামীণ সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং জনগণের দারিদ্র্যবস্থায় তেমন কোন উন্নতি ঘটছে না। যদিও সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পল্লী অঞ্চলে পরিচালিত হচ্ছে তথাপি এ সব কার্যক্রমের দ্বারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না।

কৃষি নির্ভর গ্রামীণ বাংলাদেশে ভূমি মালিক এবং বর্গাচাষীদের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্গাচাষীর জীবন বহুলাংশে ভূমি মালিকের ইচ্ছা বা মর্জি নির্ভর। এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, প্রশাসনিক, পারিবারিক প্রয়োজনে বর্গাচাষীদের ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের অবস্থা সামন্ত সমাজ কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর আরেকটি দিক মহাজনী প্রথা। যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী মহাজনী প্রথার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। জমি চাষের প্রাথমিক মূলধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানি ইত্যাদি কারণে দরিদ্র জনগণ মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে। পরিবর্তিতে এই ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্র কৃষককে চিরস্থায়ী খাতে পরিণত করে। অনেক সময় দেখা যায় বংশানুক্রমিকভাবে ঋণের এ বোঝা বহন করতে হয়। যদিও ইদানীং কালে বিভিন্ন এন,জি,ও, তৎপরতার ফলে প্রথাগত মহাজনী ব্যবস্থার প্রকোপ কিছুটা কমেছে। তবে এন,জি,ও,দের ঋণ কর্মসূচীতে সুদের হার অত্যন্ত চড়া হওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের অসুবিধা সম্পূর্ণ লাঘব হয় নি।

বর্গাচাষীর জীবন বহুলাংশে ভূমিমালিকের ইচ্ছা বা মর্জি নির্ভর।

নগর সমাজ কাঠামো

গ্রামীণ বাংলাদেশে 'ভূমি'ই অর্থনৈতিক ভিত্তি। নগরেও ভূমি অন্যতম মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত। তবে নগরাঞ্চলে মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে আরো অন্তর্ভুক্ত করা যায় - শিল্প কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, ট্রান্সপোর্ট, শপিং কমপ্লেক্স। বাংলাদেশের নগরাঞ্চলেও গ্রামের মত অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান। একদিকে মুষ্টিমেয় একটি অংশ অতি ধনীতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের জীবন যাত্রার মানও ক্রমশ নিম্নমুখী। সে সাথে গ্রাম থেকে আগত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এ সব প্রবণতার ফলে বাংলাদেশের নগর সমাজ কাঠামোতে সার্বক্ষণিক শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বাংলাদেশের নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।

সারকথা: *সমাজ হলো পারস্পরিক ধ্বংসসাধনের মানসিকতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহনশীলতা। সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। যেহেতু মানুষই সমাজের মূল উপাদান সেহেতু সমাজ কাঠামো বলতে আমরা বুঝি, আন্ত:ব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং নগর সমাজ কাঠামোয় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামে 'ভূমি'ই প্রধান সম্পদ এবং ভূমি মালিকানার ভিত্তিতেই সাধারণত: সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে শহরে ভূমি মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হলেও শিল্প কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, ট্রান্সপোর্ট, শপিং কমপ্লেক্স ইত্যাদিও মূল্যবান সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হয়।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. 'সমাজ' অর্থ

ক) সহযোগিতা;

খ) হিংসা;

গ) ধ্বংস-সাধন;

ঘ) পরস্পরের ক্ষতি সাধন ।

২. সমাজের বৈশিষ্ট্য

ক) অপরিবর্তনীয়তা;

খ) পরিবর্তনশীলতা;

গ) অস্থিতিশীলতা;

ঘ) কোন্দল।

৩. গ্রামীণ বাংলাদেশে প্রধান সম্পদ

ক) ভূমি;

খ) খাল-বিল;

গ) দালান- বাড়ী;

ঘ) গরু-ছাগল।

সংক্ষিপ্ত উত্তমূলক প্রশ্ন

১. সমাজ কাঠামো বলতে কি বুঝায়?

২. সমাজ এর সংজ্ঞা কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ ১। ক) ২। খ ৩। ক

সহায়ক গ্রন্থ

১. *রঙ্গলাল সেন 'সমাজ কাঠামো: পঁ জিবাদ ও সমাজতন্ত্র'১৯৯৮ (ঢাকা)*

পাঠ - ৩

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা
Culture and Civilization of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ উপসংস্কৃতি এবং বিকল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা করতে পারবেন।

সংস্কৃতি

সমাজ বিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি'কে ব্যাপক অর্থে বিবেচনা করা হয়। যে কোন সম্পূর্ণ জীবন যাত্রা এবং জীবন যাত্রার সবগুলো দিকই 'সংস্কৃতি'র উপজীব্য বিষয়।

এডওয়ার্ড বি. টেইলর (Edward B. Tylor)'র মতে, সংস্কৃতি হল সমাজের পূর্ণাঙ্গ দিকের জটিল ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি তৈরি হয় সমাজের প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, চারুকলা, নৈতিকতা, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির সমন্বয়ে।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে, **'সংস্কৃতি'** র সাথে অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যে কোন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিই হচ্ছে তার মৌল কাঠামো, এই মৌল কাঠামোকে ঘিরে গড়ে উঠে অধিকাঠামো। আর এই অধিকাঠামোই হলো সংস্কৃতি। উদাহরণ স্বরূপ, কোন সমাজে যদি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে সেই পুঁজিবাদী মৌল কাঠামোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি।

যে কোন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিই হচ্ছে তার মৌল কাঠামো।

'সংস্কৃতি' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণাকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করা যায়-

'সংস্কৃতি' হচ্ছে জীবন যাত্রা প্রণালী। আবার জীবনযাত্রা প্রণালী মানুষের পেশার উপর নির্ভরশীল। তাই সংস্কৃতির সাথে পেশা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যেমন, বাংলাদেশের সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন প্রণালীতে পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও তাদের মধ্যে ভাষা, নরবংশ, ভৌগলিক বাসস্থান, ইতিহাস-ঐতিহ্যগত ঐক্য রয়েছে ।

সমাজের সদস্য হিসাবে বসবাস করার ফলে মানুষ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, আচার ব্যবস্থা ইত্যাদি আত্বস্থ করে। তাই বলা যায়, সামাজিকীকরণের দ্বারা মানুষ সমাজ থেকে যা অর্জন করে তাই সংস্কৃতি।

সভ্যতা

সভ্যতা বলতে বোঝায়, মানবিক প্রয়াসের দ্বারা অর্জিত সাফল্য-যার বস্তুগত রূপায়নের দ্বারা সংস্কৃতির উন্নতির পর্যায় নির্দেশ করা যায়। এ কারণে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ নিজের সৃজনশীলতা দ্বারা যে সামগ্রিক সমাজ জীবন গড়ে তোলে তার বস্তুগত প্রতিফলনকে সভ্যতা বলা যায়। এই অর্থে বাসস্থান, অফিস, কল-কারখানা, যান বাহন, রাস্তাঘাট সব কিছু মিলে যে বস্তুগত সংস্কৃতি-তাই সভ্যতা।

ম্যাকাইভার

ম্যাকাইভার (MacIver)-এর ও মতে, আমরা যা সেটাই সংস্কৃতি এবং যা আমরা ব্যবহার করি, যা আমাদের আছে, তাই সভ্যতা।

ম্যাথিউ আরণল্ড

ম্যাথিউ আরণল্ড **(Mathew Arnold)** মনে করেন, কোন বস্তু বা পদার্থ থাকা বা অর্জন করাই সভ্যতা, সভ্যতা একটি বাহ্যিক পরিবেশ বা অবস্থা।

বস্তুতঃ সভ্যতা বাহ্যিক বলেই তা যান্ত্রিক। মানুষের উদ্দেশ্য বা উপযোগিতা পূরণের কলাকৌশলকে সভ্যতা বলা যায়। সভ্যতার ফল যে কেউ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এলাকার সংস্কৃতি অন্য এলাকায় সহজে গৃহীত নাও হতে পারে। যেমন, পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার কলাকৌশল আমরা আয়ত্ব করতে চাই এবং এর ফল ভোগ করতে চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনেক দিকই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংস্কৃতি

'সংস্কৃতি'র মত 'উপ সংস্কৃতি'ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজই 'বহুজাতি' ভিত্তিক। এ কারণে একই সংস্কৃতির ভেতরে বিভিন্ন ধরণের উপ সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোতে বহুজাতি বা এথনিক গোষ্ঠী বসবাস করে। এদের সকলেরই উপসংস্কৃতি বিদ্যমান। যদিও সবাই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বসবাস করছে। উদাহরণ স্বরূপ, লন্ডন শহরে বাঙালি, আফ্রিকান ইত্যাদি ধরনের এথনিক জনগোষ্ঠী বাস করে। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, উপসংস্কৃতি হলো এক ধরনের জীবনযাত্রা যা 'বৃহত্তর' সংস্কৃতি বা জীবনযাত্রা থেকে আলাদা। এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। যদিও এরা সমাজের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের অংশ।

বিকল্প সংস্কৃতি

'বিকল্প সংস্কৃতি'ও এক ধরণের উপসংস্কৃতি। কিন্তু সব উপ সংস্কৃতিই বিকল্প নয়। বিকল্প সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝবো, যখন কোন জনগোষ্ঠীর একটি অংশ নির্দিষ্ট অভিরুচি বা আদর্শের ভিত্তিতে বিকল্প জীবনযাত্রা প্রচলনে তৎপর হয়। যেমন, ষাটের দশকে আমেরিকায় হিপ্পি আন্দোলন। সে সময়, ভোগবাদী বস্তুবাদী সমাজের সমস্যা এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সহিংসতায় হতাশ, উচ্চবিত্ত আমেরিকান পরিবারের সন্তানরা এক ধরনের 'সাম্যবাদী' সমাজ তৈরির চেষ্টা করে। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করে এবং দলবদ্ধ ভাবে বাস করতে শুরু করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংস্কৃতি আলোচনার প্রথমেই গ্রাম এবং শহর এই বিভাজন সামনে চলে আসে। কেননা গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতির মধ্যে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। সেজন্যই বাংলাদেশের সংস্কৃতির আলোচনাকে গ্রাম এবং শহর এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রামীণ সংস্কৃতি

বস্তুতঃ সমগ্র বাংলাদেশ হচ্ছে একটি বিশাল গ্রাম। জনসংখ্যার ৮০ ভাগের ও বেশী অংশ গ্রামে বসবাস করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে ভূমি নির্ভর মর্যাদা-সম্পর্ক বিদ্যমান। এখনো পর্যন্ত ভূমি মালিকানার নিরীখেই গ্রামীণ সংস্কৃতিতে উচ্চতর অধঃস্তন স্থান নির্ণীত হয়। ধনী চাষী এবং ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীর মধ্যে মুরুব্বী মক্কেল সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার এদের দৈনদিন জীবন-যাপন প্রণালী খাদ্যাভাস, পোষাক-পরিচ্ছেদেও বিভিন্নতা আছে। এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণ মূলত: অর্থনৈতিক। গ্রামের সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান গুলোতে যদিও সমরূপতা আছে। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ধনী পরিবার এবং দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, গ্রামের ধনী পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠান এবং দরিদ্র পরিবারের বিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তবে গ্রামীণ বাংলাদেশে বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একধরনের পরিবর্তন এসেছে। ঘরবাড়ি, আসবাব পত্র, তৈজস দ্রব্য, পোষাক ব্যবহারে পূর্বের সাথে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মাটির তৈজস দ্রব্যের স্থলে স্টীল বা এ্যালুমিনিয়ামের তৈজস পত্রের ব্যবহার বেড়েছে। আসন- পিঁড়ির স্থলে মোড়া-চেয়ারের গ্রহণযোগ্যতা এসেছে। আবহমান কালে মুড়ি-চিড়া-খই'র পরিবর্তে পরাটা, চা, কলের সেমাই, বিস্কুটের প্রচলন বেড়েছে।

চিত্তবিনোদনের জগতে জারী-সারি, কবির লড়াই, যাত্রা, পালা আজ বিলুপ্ত প্রায়। সে স্থলে রেডিও, বিশেষতঃ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

নগর সংস্কৃতি

বাংলাদেশের উপজাতির মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং নগর সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন সম্প্রসারিত সুযোগ সুবিধার ফলে নাগরিক সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, টিভি, স্যাটেলাইট, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি শহুরে লোকদের বিনোদন বা অবকাশ যাপনের উপায়। পোশাক- পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ বাংলাদেশে এখনো শাড়ী, লুঙি, পায়জামা- পাঞ্জাবীর আধিক্য দেখা যায়। অন্যদিকে শহরে শার্ট-প্যান্ট, স্যুট, সাফারী, জিন্স, সালোয়ার- কামিজ, টপস্-স্কার্টস ইত্যাদির বেশী ব্যবহার দেখা যায়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ এবং বিনোদনের বিকল্প উৎসসমূহ (ভিডিও, সিডি, স্যাটেলাইট টিভি) সহজলভ্য হবার ফলে অল্প কয়েক বছরেই বাংলাদেশের নাগরিক সংস্কৃতিতে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এসেছে। তবে বাংলাদেশ সহ যে কোন সংস্কৃতির আলোচনাতেই লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হলো প্রতিটি সংস্কৃতির রক্ষক থাকে এবং এই রক্ষকই সংস্কৃতির ব্যাখ্যা তৈরি করে। এই ব্যাখ্যা হচ্ছে - প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা ক্ষমতার ভিত্তিতে তৈরি হয়। সর্বোপরি সমাজের উপর প্রভূত্বের আধিপত্য তৈরি হয়, এই ক্ষমতার মাধ্যমে।

সারকথা: *সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন যাত্রা প্রণালী। সামাজিকীকরণের দ্বারা মানুষ সমাজ থেকে যা অর্জন করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সাথে অর্থনীতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। ম্যাকাইভারের মত অনুসরণ করে বলা যায় আমরা যা সেটাই সংস্কৃতি এবং যা আমরা ব্যবহার করি, যা আমাদের আছে তাই সভ্যতা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ভূমি নির্ভর মর্যাদা সম্পর্ক বিদ্যমান। ধনী চাষী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর মধ্যে মুরুব্বী মক্কেল সম্পর্ক টিকে আছে। ধনী ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানগুলোতে একধরনের সমরূপতা থাকলেও বাস্তবে বহু ফারাক রয়েছে। যেমন গ্রামের ধনী পরিবার ও দরিদ্র পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে বিস্তর মাত্রাগত তথাৎ আছে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। সংস্কৃতি'র সাথে অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।এ মতবাদ-
ক) পুঁজিবাদী;
খ) মার্কসবাদী;
গ) সামন্ততান্ত্রিক;
ঘ) মৌলবাদী।

২। আমরা যা সেটাই সংস্কৃতি - এ মত প্রকাশ করেন,
ক) ম্যাকাইভার;
খ) ম্যাথিউ আরণল্ড;
গ) কার্ল মার্কস;
ঘ) এডওয়ার্ড বি, টাইলর।

৩। গ্রামীণ বাংলাদেশে ধনী চাষী এবং ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা হলো-
ক) পিতা - পুত্র;
খ) মুরুব্বী - মক্কেল;
গ) ভাই - বন্ধু;
ঘ) গৃহস্বামী - ভৃত্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূল প্রশ্ন

১. বিকল্প সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় ?
২. সভ্যতা কি ?
৩. সংস্কৃতির ধারণা কি ভাবে ব্যক্ত করা যায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতি আলোচনা করুন।

উত্তরঃ ১।খ ২। ক ৩। খ

সহায়ক গ্রন্থ

১। *'সমাজ নিরীক্ষণ' (জার্নাল) ; সংখ্যা ৪৬, (১৯৯২)*
২। *রেবতী বর্মন 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ'*
৩। *বদরুদ্দীন ওমর 'সংস্কৃতির সংকট'*

পাঠ-৪

বাংলাদেশের উপজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি

History and Culture of Tribal People in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ 'উপজাতি' বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতি আলোচনা করতে পারবেন।

উপজাতি

উপজাতির কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পতিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে **'উপজাতি '** শব্দটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

কোহেন ও ইয়ামস

নৃ- বিজ্ঞানী কোহেন ও ইয়ামস 'Cultural Anthropology' (১৯৮১)' গ্রন্থে অর্থনৈতিক কৌশলের দৃষ্টিকোন থেকে 'উপজাতি'র সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে, উপজাতি হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের জীবিকার জন্যে খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান কৃষি এবং পশু পালনের উপর নির্ভর করে।

রবার্ট বি. টাইলর

রবার্ট বি. টাইলর 'Cultural Ways' (১৯৮০)গ্রন্থে সংস্কৃতি'র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজাতির সংজ্ঞা দান করেছেন। তাঁর মতে, তেমন একটি জনগোষ্ঠীকে উপজাতি বলা যায় যারা মোটামুটি একটি অঞ্চলে সংগঠিত। যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান এবং যারা মনে করে নিজেরা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের 'উপজাতি'দের এ নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা এদের কেউই-রাষ্ট্রীয় শাসনের বাইরে স্বাধীন গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজে বাস করছে না।

উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয় বিশ্লেষণ করে, উপজাতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

- উপজাতি প্রায় নির্দিষ্ট একটি এলাকায় বসবাস করে।
- উপজাতির একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান।
- উপজাতির সকলের মধ্যে সমধরনের অর্থনৈতিক জীবন প্রণালী লক্ষনীয়। সকল সদস্য ঐক্যের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের উপজাতি: জাতি হিসাবে বাংলাদেশের অধিবাসীদের পরিচয়ের মধ্যে 'উপজাতি'গুলো স্বতন্ত্র ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়সহ যুক্ত নয়। সামগ্রিক ভাবে এরা রয়ে গেছে মূলধারা'র বাইরে প্রান্তিক অবস্থানে। ইংরেজী **ট্রাইব (Tribe)** থেকে বাংলায় **'উপজাতি'** শব্দটি এসেছে। নৃ-বিজ্ঞানে 'উপজাতি' বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়, যাদের সমাজ ব্যবস্থা জ্ঞাতি সম্পর্ক নির্ভর এবং রাষ্ট্রের উপাদানগুলো অনুপস্থিত থাকে , সে অর্থে বাংলাদেশের উপজাতিদের এ নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা এদের কেউই রাষ্ট্রীয় শাসনের বাইরে স্বাধীন গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজে বাস করছে না। অনেক গবেষক মনে করেন, ব্রিটিশ'রা পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসীদের বর্বর, অসভ্য বিবেচনা করে উপনিবেশবাদী মানসিকতা থেকে একই অর্থে 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছিল। যার পেছনে কোন সৎ যুক্তি পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের উপজাতিসমূহের ইতিহাস

বাংলাদেশে ২০টির অধিক উপজাতি বসবাস করে। এদের অধিকাংশেরই বাস পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলাতেও (পটুয়াখালী, রাজশাহী, দিনাজপুর,ময়মনসিংহ, সিলেট ইত্যাদি) কয়েকটি উপজাতি বাস করে। বাংলাদেশের উপজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা,

ম্রো, চাক, খ্যাং, খুমি, লুসাই, পাংখো, বোম, রাখাইন, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস। বিভিন্ন ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক কারণে এই উপজাতিসমূহের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনধারা আমাদের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেছে। নিম্নে তিনটি উপজাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

চাকমা

চাকমাদের অতীত ইতিহাস স্পষ্ট নয়। কিংবদন্তী অনুসারে চাকমারা বিশ্বাস করে, তারা সুদূর অতীতে চম্পক নগর নামক রাজ্যে বাস করত। পরবর্তীতে বিজয়গিরি'র নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ও আরাকানের কিছু অংশ জয় করে এবং বিজয়ী সৈন্যরা এ অঞ্চলে বাস শুরু করে। সম্ভবত: নবম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ড় আরাকানের বেশ কিছু অঞ্চল চাকমা শাসনাধীনে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমারা প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস শুরু করে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। মুঘল যুগে চাকমাদের সাথে মুঘলদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে চাকমারা কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্ড়ানের অন্ড়র্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে উপযুক্ত পূনর্বাসন না হওয়ায় অন্যান্য উপজাতির মত চাকমাদের জীবনেও দুর্ভোগ নেমে আসে। অনেক চাকমা বাস্তুহারা ও ভূমিহীন হয়। অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশের উপজাতির মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয়। এদের টিপরা, তিপারা ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। চাকমারা এদের **'তিবিরা' লুসেইরা 'তুইকুক্'** এবং মারমারা **'ম্রং'** নামে অভিহিত করে। (ত্রিপুরাদের মূল জনগোষ্ঠি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে)। ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ **'শ্রীরাজমালা'** থেকে জানা যায়, পঞ্চদশ শতকে ও রাজা রত্নমানিক্যের আমলে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রিয়াং দলের লোকেরা মাইয়ুনী উপত্যকায় বাস করতো। রিয়াং, নাইতং, ফাতুং, রাংখল ইত্যাদি সহ ত্রিপুরাদের মোট ৩৬ টি 'দল 'আছে । *Joa de Barros* কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে অংকিত মানচিত্রে দেখা যায়, কর্ণফুলী নদীর উত্তর ভূখন্ড ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল। এখানকার রিয়াংরা রাজা গোবিন্দ মানিক্যের শাসনকালের (১৬৬০-৬৬খৃ:) প্রথম দিকে বিদ্রোহ করলে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো হয়। এরও পূর্বে ত্রিপুরার রাজা উদয়গিরি বা উদয়মানিক্যের শাসনকালে (১৫৬৭-৭২ খৃ:) মাতামুহুরী নদীর উপত্যকায় ত্রিপুরাদের ফাতং, হারবাং, ইত্যাদি দলের লোকদের আবাস ছিল। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজাদের শক্তি কমতে থাকলে ত্রিপুরা উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের চেয়ে উত্তরাংশেই অধিক পরিমানে স্থায়ী হয়। ব্রিটিশরা যখন পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলার সৃষ্টি করে, তখন এর উত্তরাঞ্চল ছিল ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। কিন্তু সেখানে 'মং' সার্কেল গঠন করা হলে, ত্রিপুরাদের আ পরিচয়ের উপর আঘাত তৈরি হয়। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ ত্রিপুরাদের পক্ষে একজন **'মগ' বা 'মারমা'**কে ন তন রাজা হিসাবে মেনে নেয়া কঠিন ছিল।

ত্রিপুরা উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয়।

সাঁওতাল

বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কারণে ধারণা কথা হয় যে, সাঁওতালরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোক। অষ্ট্রিক নরবংশের সাথে সাঁওতালদের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। যেমন - মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারী, নাক চেপ্টা ও চওড়া, গায়ের রং কালো এবং চুল ঢেউ খেলানো। এক সময় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বাস উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ড় মহাসাগরের ইষ্টার দ্বীপ পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত ছিল। অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে তারা ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিল। অষ্ট্রিক ভাষী এই জনগোষ্ঠী উত্তর- পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে কি ভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয়, তার কোন একক ব্যাখ্যা নেই। সাঁওতালরা এদেশের ভূমিপুত্র নয়। অনেক গবেষক মনে করেন, সাঁওতালদের আদি বাসস্থান **'চায়চাম্পা'র** অবস্থান ছিল হাজারিবাগ মালভূমির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে। ইতিহাস প্রমাণ করে, সাঁওতালরা ইত:স্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বাস করেছে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদের নির্বিঘ্নে বসবাসের জন্য স্থায়ী এলাকা ঠিক করে দেয়- এই এলাকা পরবর্তীতে সাঁওতাল

ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ফলে সাঁওতালরা আদি নিবাস ছেড়ে বাংলা, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরায় স্থানান্ড়রিত হতে বাধ্য হয়।

পরগনা নামে পরিচিত হয়। এর পূর্ব নাম ছিল **'দামিনিকো'**। ১৮৫৫-৫৭ সালে বিহারে স্থানীয় জমিদার, মহাজন, প্রশাসকদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে এবং পরাজিত হয়, তখন ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ফলে সাঁওতালরা আদি নিবাস ছেড়ে বাংলা, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরায় স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়।

সাঁওতাল সমাজে নানা ধরনের সংস্কার প্রচলিত। এরা সারা বছরই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

বাংলাদেশের উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে **পার্বত্য শান্তি চুক্তির** পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশেও এ প্রবণতা অব্যাহত ছিল। একই রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও উপজাতিদের সম্পর্কে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অজ্ঞতা বিদ্যমান। মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার কোন উদ্যোগ পূর্বে গ্রহণ করা হয় নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, দীর্ঘদিনের ক্ষোভ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের অনুভূতি থেকে বিশেষতঃ স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবীতে উপজাতি জনগোষ্ঠী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। এর ফলে বহু প্রাণহানি এবং সম্পদহানি ঘটে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে **পার্বত্য শান্তি চুক্তি** স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে এ সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক পরিসমাপ্তি হয়েছে।

বাংলাদেশের উপজাতির সংস্কৃতি

এখানে চাকমা, ত্রিপুরা এবং সাঁওতাল এই তিনটি উপজাতির সংস্কৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

চাকমা ভাষা

বর্তমান চাকমা জনগোষ্ঠী এক ধরণের বাংলা উপভাষায় কথা বলে এবং বাংলা হরফে ঐ বাংলা উপভাষায় লেখার কাজ করে । পূর্বে তারা আরাকানী ভাষায় কথা বলতো যা **'টিবে-টো- বার্মান'** ভাষার পরিবারভুক্ত ছিল।

ধর্ম

চাকমারা প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাড়ী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, কাত্তির্কী পূর্ণিমা ইত্যাদি দিবস তারা ধর্মীয় ভাবে পালন করে। চাকমা সমাজে বহুধরনের উৎসব, পূজা- পার্বণ প্রচলিত। থানমানা, হালপালানি, ভাতদ্যা, বিঝু উৎসব উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতি

চাকমা জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগত ভাবে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। তবে সরকারীভাবে জুম চাষকে নিরুৎসাহিত করা হয়। জমির উত্তরাধিকার পুত্র সন্তানের উপর বর্তায়। কন্যারা এই অধিকার বঞ্চিত। চাকমা সমাজে জুম জমিতে পুরোপুরি ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নয়। যে যার পছন্দমত জমি জুম চাষ করতে পারে। তবে হাল কৃষির অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানাধীন। মোরগ - মুরগী ও শুকর পালন চাকমা অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক গঠন

পরিবার চাকমা সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। এ পরিবারগুলো পিতৃতান্ত্রিক। চাকমা সমাজে বহু বিবাহ অনুমোদিত। আধুনিক সময়ে, শিক্ষা প্রসার, মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপক বিকাশ ইত্যাদি কারণে সনাতন চাকমা সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, দীর্ঘদিনের ক্ষোভ -বঞ্চনা - বৈষম্যের অনুভূতি থেকে উপজাতি জনগোষ্ঠী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে ।

ত্রিপুরা ভাষা

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে । এ ভাষার নাম **'কক্‌বরোক'**। 'কক্‌বরোক' ভাষা ত্রিপুরাদের বৃহত্তর ভাষা 'বোডো' (Bodo) দলের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে ত্রিপুরাদের অন্যতম শাখা উসাইরা পরবর্তীতে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরারা ১৪ জন দেবদেবীর পূজা করে । বিভিন্ন পূজায় দেবতার উদ্দেশ্য পশুপাখি বলি দেয়া হয়।

জন্ম-মৃত্যু

ত্রিপুরা শিশুর জন্মের পর তাকে গরম জলে গোসল করিয়ে মুখে মধু দেয়া হয়। এক বোতল মদ , নতুন কাপড় এবং টাকার বিনিময়ে ত্রিপুরা মা ধাইয়ের কাছ থেকে শিশুকে কিনে নেন। শিশুর নামকরণের সময় বিভিন্ন নামসহ ৫/৭ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়, যে প্রদীপ বেশী উজ্জ্বল থাকে সে নামে শিশুর নামকরণ হয়। ত্রিপুরা সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হয়। ত্রিপুরারা বিশ্বাস করে শেষ বিদায় কালে শোক প্রকাশ করলে মৃতের অমঙ্গল হয়। তাই শোক থাকলেও মৃতদেহ সৎকারের সময় আনন্দ -উৎসব পালন করা হয়।

সাঁওতাল

খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ

বাংলাদেশের সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। সেই সাথে মাছ- মাংসের ব্যবহার প্রচলিত। সাঁওতাল রমনীরা নানারকম পিঠা তৈরি করে। দারিদ্র সাঁওতালরা পান্ড্র ভাত গ্রহণে অভ্যস্ত। সাঁওতাল সমাজে নেশা জাতীয় দ্রব্যের প্রচলন অধিক। উৎসব-অনুষ্ঠানে ভাত পচানো মদ বা হাড়িয়া পরিবেশন করা হয়। দরিদ্র সাঁওতালরা সাধারণত: নেংটি পরিধান করে। অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের পরিধেয় - ধুতি, লুঙ্গি। শিক্ষিত সাঁওতালরা প্যান্ট, সার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি পরিধান করে।

জন্ম-মৃত্যু

সাঁওতাল সমাজে সন্ড্রান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে আনন্দ- উল্লাসের সৃষ্টি হয়। পরিবারের অভিজ্ঞ রমনীরা ধাত্রীর দায়িত্ব পালন করে। শিশু'র জন্মের পর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেমন অন্নপ্রাশন। শিশুর পাঁচ অথবা পনেরো দিনে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে নিমপাতা দ্বারা রান্না করা ভাত আমন্ত্রিতদের পরিবেশন করা হয়। পূর্বে দাহ করার প্রচলন থাকলে ও বর্তমানে সাঁওতাল সমাজে মৃতদেহ কবর দেয়া হয়। কবর দেয়ার আগে মৃতদেহ ধৌত করা হয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, মৃত ব্যক্তি পরকালে জীবিত হয়ে স্বর্গে যাবে। এ জন্য মৃতদেহের সাথে সাধ্যমত টাকা - পয়সা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেয়া হয়। মৃতদেহ কবরে নেয়ার পথে খৈ ছিটানো হয়।

উৎসব অনুষ্ঠান

সাঁওতাল সমাজে নানা ধরনের সংস্কার প্রচলিত। এরা সারা বছরই বিভিন্ন উৎসব- অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। সাঁওতালরা জাঁকজমকের মাধ্যমে উৎসবগুলো পালন করে। বাংলা ফাল্গুন মাসে নববর্ষ উদযাপিত হয়। সালসেই, বোঙ্গাবুঙ্গি, হোম, এরোরা, হাড়িয়া, দিবি, সোহরাই ইত্যাদি সাঁওতালদের উলে- খযাগ্য উৎসব।

সারকথা: *উপজাতির কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোকে উপজাতিকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, উপজাতি প্রায় নির্দিষ্ট একটি এলাকায় বাস করে। এদের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। সমধরনের অর্থনৈতিক জীবন প্রণালী এবং সকল সদস্য ঐক্যের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় বিশটির অধিক উপজাতি বাস করে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস আছে। বাংলাদেশের উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সালে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি'র পূর্ব পর্যন্ত এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। Cultural Anthropology গ্রন্থের লেখক
ক) কার্ল মার্কস;
খ) কোহেন ও ইয়ামস;
গ) রবার্ট বি, টাইলর;
ঘ) জন লক ।

২। সাঁওতালদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে যে জনগোষ্ঠীর
ক) অষ্ট্রিক;
খ) ককেশয়েড;
গ) মঙ্গোলীয়;
ঘ) এক্সেমো।

৩। **চাকমারা প্রধানত:** কোন ধর্মের অনুসারী ?
ক) হিন্দু;
খ) খ্রিষ্টান;
গ) বৌদ্ধ;
ঘ) জৈন।

৪। ত্রিপুরারা কতজন দেবদেবীর পূজা করে ?
ক) ১১;
খ) ১২;
গ) ১৩;
ঘ) ১৪।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উপজাতি'র সংজ্ঞা কি ?
২. সাঁওতাল উপজাতির বিভিন্ন সময়ে বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চাকমা এবং ত্রিপুরা উপজাতির সংস্কৃতি আলোচনা করুন।

উত্তর: ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ

সহায়ক গ্রন্থ

১. *সুগত চাকমা 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি' (১৯৯৩); ঢাকা।*
২. *ড: মুহম্মদ আবদুল জলিল, 'বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি '(১৯৯১), ঢাকা।*

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন
Different Movement in Bangladesh

পাঠ-৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- প্রাচীন কাল থেকে ব্রিটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জনগোষ্ঠীর আন্দোলন -সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাকিস্ড়ানী শাসন আমলে বাঙালি জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাচীন কাল থেকে ব্রিটিশ শাসন পূর্বকাল

বাঙালিরা এমন এক জাতি, যার ইতিহাস বারবার পরাজিত হয়েছে বিকৃতি আর অসত্যের কাছে। এই বিকৃতির শুরু প্রাচীন কালে।

বাঙালিরা এমন এক জাতি, যার ইতিহাস বারবার পরাজিত হয়েছে বিকৃতি আর অসত্যের কাছে। এই বিকৃতির শুরু প্রাচীন কালে। যখন আর্য-অনার্য যুদ্ধে এখানের আদিবাসী অনার্যরা পরাজিত হয়েছিল। জয়ী আর্যরা নিজেদের মত করে ইতিহাস রচনা করে ।এই ইতিহাস রাক্ষস, নাগ, দৈত্য, অসুর, পাখী ইত্যাদি গোষ্ঠী এবং শ্রেণীতে বিভক্ত আদিবাসীদের কুৎসিত চিত্র তৈরি করে। তাদের 'জন্তু' তে পরিণত করা হয়। অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর আর্যদের জয়ের প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী। প্রাচীন বাঙালির সকল শ্রেষ্ঠত্ব এবং বীরত্বের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়। যদিও বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য ও অনার্য ভাবধারা, ধর্মীয় মতাদর্শের আড়ালে এ অঞ্চলে চলেছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরোধ, বিদ্রোহ, সংঘাত। এমনকি একাদশ-দ্বাদশ শতকেও যখন উঁচু সমাজে আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়, তখনো নিম্নবর্গের মানুষের কাছে লোক সংস্কৃতি, লোক ভাবাদর্শই একমাত্র মতাদর্শ ছিল। আদি বাঙালির সংগ্রাম কখনো বন্ধ হয় নি।

মধ্যযুগ

হাজার বছর আগে, অষ্টম শতকে ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুক্তি সংগ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলের কৈবর্ত কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়। এ সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পাশাপাশি শ্রেণী সংঘর্ষের রূপও লাভ করে। কৈবর্ত বিদ্রোহী নেতা দিব্যেক সংগ্রামে জয় লাভ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

মুঘল আমল

বাংলাদেশে সমগ্র মুঘল শাসন আমলেই কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়।যদিও এদের রূপ ছিল বিভিন্ন রকম- আঞ্চলিকতা,ধর্মগত বিরোধ, শ্রেণীগত শাসন -শোষণ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

ব্রিটিশ আমল

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলার ক্ষমতা দখল করে। সেই থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, প্রায় দু'শত বছর বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়কালেও বাঙালি জাতি বিভিন্ন আন্দোলন - সংগ্রামের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), বাকেরগঞ্জ বিদ্রোহ (১৭৯২) এবং এ সময়ের উপজাতীয় বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, অঞ্চল-ভিত্তিতে এ আন্দোলনগুলো সংগঠিত হয়। ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০),সিলেট বিদ্রোহ

(১৭৮২, ১৭৯৯),কুমিল-ার ফিরিঙ্গী খেদাও বিদ্রোহ(১৮৯৭)-এই প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ধর্মীয় কারণে তৈরি হলেও পরে গণবিদ্রোহের রূপ পায়।

কৃষক বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৩৩),ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), তিতুমীরের বাঁশের কেল-া (১৮৩১),নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১) প্রভৃতিও ছিল উলে-খযোগ্য। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও পরবর্তীতে তার পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারগুলো উচ্ছেদের পাশাপাশি ইংরেজ শাসক এবং সুবিধাভোগী জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ আন্দোলন শাসকদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় অনেক স্থানেই রাষ্ট্রশক্তি ফারায়েজীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এ সমস্ত বিদ্রোহে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র তথা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আঘাত তৈরি করে।১৮৫৭ সালে, ভারত ব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংগঠিত হয়। এ বিদ্রোহে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের জনগণ সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে জড়িয়ে পড়ে।১৮৮৫ সাল ব্রিটিশ আনুগত্যের শপথ নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও পরবর্তীতে এ দল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে । ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে । এ সময়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় । ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশের দশকে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণও খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনে **একান্ত** হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীরা শুধু অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্রগ্রামকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরিকল্পনা করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো এক ধাপ অগ্রসর করে ।

নানকার বিদ্রোহ (১৯২২-১৯৪৯),টংক আন্দোলন (১৯৩৭-১৯৪৯), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) প্রভৃতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবস্থা পর্যন্ত ছিল। এ সব সংগ্রাম পরিচালনা ও সংগঠিত করার জন্য প্রথম বারের মত রাজনৈতিক শক্তি জড়িত হয়। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় । এ আন্দোলন সমগ্র বাংলা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । কলিকাতা এবং ঢাকায় ধর্মঘট হয়। ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ৫ জন প্রাণ হারায় । ১৮-৩০ আগষ্ট এই হত্যাকন্ডের প্রতিবাদে কোন সংবাদপত্র বের হয় নি।

পাকিস্তানী শাসন আমল

১৯৪৭ সালে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে, ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান - এ দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের কারণে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অঞ্চলের জনগণের আশা ছিলো, স্বাধীন রাষ্ট্রে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে, শাসন - শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে । কিন্তু স্বাধীনতার অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গালিদের আশা ভঙ্গ হয়। দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানীরাও ব্রিটিশ শাসকদের মতই শোষণ এবং লুণ্ঠণেই আগ্রহী। এ থেকেই বাঙালীদের মধ্যে অসন্তোষ জমা হতে থাকে। শুরু হয় বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রাম । যার পরিণতি ১৯৭১ এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। এখানে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সংগঠিত প্রধান কয়েকটি আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবীতে ১৯৫২ সালে 'ভাষা আন্দোলন' সংগঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবী জানানো হয়। এরপর ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশের আপামর জনগণ। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাত্ররা এই দাবী বাস্তবায়নের জন্য সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাসক গোষ্ঠী গুলি চালায়। শহীদ হয় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিক প্রমুখ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। 'উর্দূ'কে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষার স্থান দেয়া হয়। অথচ বাংলা ভাষা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা। ১৯৪৮ সাল থেকেই

বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে । ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তা পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়। ভাষা-আন্দোলনের ফলে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনায় বিপুল পরিবর্তন আসে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার উন্মেষ ঘটে।

১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন

১৯৫৮সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। তখন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা জনমত গড়ে তোলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল । বাঙালি ছাত্র সমাজ ১৯৬২ সালে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ড় জনগণের মধ্যে বিরাজমান সামরিক শাসনের ভীতি কাটাতে সক্ষম হয়। বাষট্টি'র ছাত্র আন্দোলনের ফলেই রাজনৈতিক দলগুলো আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার সাহস পায় । বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায়:

১ **ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ:** শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা।

২ **মার্চ থেকে এপ্রিল:** আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন।

৩ **সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর:** আইয়ুব খান প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন।

১৯৬৬'র ছয় দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ-ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচী পেশ করেন। মূলত: ছয় দফা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক - এখান থেকেই বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম নতুন গতি লাভ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত শাসকদের কাছ থেকে বাঙালিদের নায্য দাবী আদায় করাই ছিল আন্দোলন -সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। কিন্তু, ছয় দফা উত্থাপনের পর আন্দোলনের চরিত্র পাল্টে যায়। তখন থেকে বাঙালির নিজেদের জন্য নিজেরাই আরো বেশী কি করতে পারে - সেই মানসিকতা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ বিদ্যমান বৈষম্যসমূহ এবং ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখায় এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আইয়ুব শাসন বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। ছয় দফা কর্মসূচী ও আন্দোলন সেই তীব্র ক্ষোভেরই বহি: প্রকাশ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

এ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার জন্য আইয়ুব সরকার নতুন পরিকল্পনা তৈরি করে । ১৯৬৮'র জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য প্রকাশ করে যে, ভারতের আগরতলায় প্রণীত পাকিস্তান বিরোধী একটি ষড়যন্ত্র তারা নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাদের মতে এ ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিলো- পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা। বলাবাহুল্য এ তথ্য ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সরকার এই অভিযোগে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী সাব্যস্ড় করে মামলা দায়ের করে। এ মামলা ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। সামরিক ট্রাইবুন্যালে গোপন বিচার শুরু হলে সমগ্র বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। এভাবেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো এক ধাপ অগ্রসর করে ।

বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের৭ মার্চ, সর্বাত্নক অসহযোগের ডাক দেন। তখন থেকেই এ অঞ্চলের উপর পাকিস্তানী আধিপত্যের অবসান ঘটে।

১৯৬৯'র গনঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দানের লক্ষ্যে প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো যৌথ ভাবে ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে। এই দাবীগুলো সাধারন জনগণের মধ্যেও গ্রহণযোগ্যতা পায়। কেননা এই দাবী গুলোর মধ্যে সমাজের সকল পেশা এবং শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ একই সাথে আন্দোলনে নেমে আসার কয়েকটি কারণ হলো - দীর্ঘ দিন যাবৎ শোষণ - বৈষম্য, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বেতার ও টি.ভি.তে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা, বাংলাভাষার তথাকথিত

সংস্কারের পুন:চেষ্টা। সরকার বিরোধী আন্দোলন পর্যায়ক্রমে এতটা তীব্র রূপ ধারণ করে যে, আইয়ুব খান শেষ পর্যন্ত পদত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

১৯৭১'র. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারের পতন হয়। ইয়াহিয়া খান নতুন সামরিক শাসক হিসাবে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ নির্বাচণের ঘোষণা দেন। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে, আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী ছিল না। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ-এর ঐতিহাসিক ভাষণে সর্ব্বক অসহযোগের ডাক দেন। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী শেষ চেষ্টা হিসাবে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা সহ সারাদেশে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালায়। তারপরও বাঙালির স্বাধীনতার আকঙ্খা দমন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবেই সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা হয়। অত:পর নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সারকথা: *বাঙালিরা এমন এক জাতি, যাদের ইতিহাস বিকৃতি আর অসত্যের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে। সুদূর অতীতে জয়ী আর্যরা নিজেদের মত করে ইতিহাস রচনা করে। সে ইতিহাসে বাঙালি অঙ্কিত হয় কুৎসিৎ জন্তু রূপে। মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে বাঙালীর শৌর্থ -বীর্যের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্বার্থে বাঙালির সংগ্রাম স্পৃহা কখনো বন্ধ হয়নি। আদি বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে মধ্যযুগ, মুঘল আমলে বীর বাঙালি লড়াই করেছে বিদেশী প্রভূদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামে বাঙালির অবদান সুবিদিত। অত:পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন-সংগ্রাম ও পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন শাসনের সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয় —

ক) ১৭৫৭ খৃ: অ:;

খ) ১৮৫৭ খৃ: অ:;

গ) ১৯৪৭ খৃ: অ:;

ঘ) ১৯৭১ খৃ: অ:

২. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল—

ক) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান;

খ) সকল স্তরে উর্দূ ভাষার প্রচলন;

গ) নতুন বাংলা রীতি চালু করা;

ঘ) ইংরেজীতে কথা বলার অধিকার লাভ।

৩. ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে —

ক) ছাত্র সমাজ;

খ) সামরিক বাহিনী;

গ) আমলা তন্ত্র;

ঘ) ব্যবসায়ী শ্রেণী।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ৬ দফা কর্মসূচী লক্ষ্য কি ছিল?

২। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়?

৩। ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের কারণ কি ছিল?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১। ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙ্গালি জাতির আন্দোলন -সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করুন।

২। ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

উত্তর: ১.ক , ২.ক, ৩.ক

সহায়ক গ্রন্থ

১। ড: মোহম্মদ হান্নান, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'(ঢাকা)। ১৯৯৬।